"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬০তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১০ই চৈত্র, ১৪৩১ / 24.03.2025

:- সম্পাদক -:

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
শ্রীপ্রীতিকুমারের শততম জন্মদিনে	সুনন্দন ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
দেব-রূপান্তর	শ্রী অরবিন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলা	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভীমার পাশে ভীমাশঙ্কর	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
চাঁদের পাহাড়ে	সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158 / 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

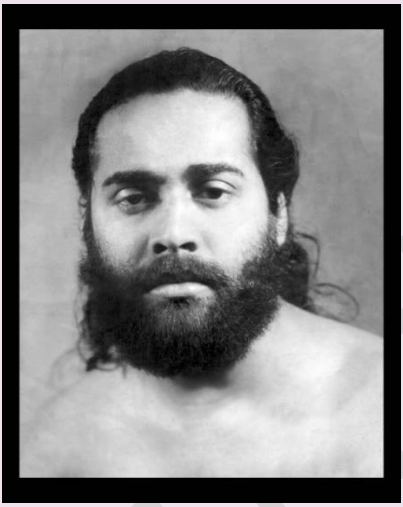

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"কোনও ভাব, কোনও ইচ্ছা, নিজস্ব কোনও রুচি – এসব থাকলে ভগবানকে ঠিকঠিক বোঝা যায় না, তাঁকে বুঝতে হলে তাঁরই মত হতে হবে এবং সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।"

DO NOT COPY

শ্রীপ্রীতিকুমারের শততম জন্মদিনে **সুনন্দন ঘোষ**

শব্দের দীনতায় হৃদয়ের ঐশ্বর্য ঢাকা পড়ে না। শরীরের মাপ মনের ব্যাপ্তিকে ব্যক্ত করতে পারে না। প্রচারের মানদণ্ডে আমরা ক্ষুদ্র, সামাজিক দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠায় আমরা গরীয়ান।

পার্থসারথি পত্রিকার প্রাণপুরুষ শ্রী প্রীতিকুমারের জন্ম ১০ই মার্চ, ১৯২৬। ১০ই মার্চ, ২০২৫-এ তাঁর শততম জন্মদিন, শততম বর্ষে পদার্পণের দিন। আমাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই বিজ্ঞাপন দিয়ে, অনুষ্ঠান করে তাঁর জন্মশতবর্ষ প্রচারের। বহু মানুষ তাঁকে স্মরণ করেন মনে বনে গোপনে । বেদনায় হোক বা আনন্দে উৎসবে, আমার কাছে মেসেজ আসে তাদের আনন্দের তাদের বেদনার কথা তাদের চিনিমামা, তাদের জ্যেঠু, তাদের দাদুর ঘরে পৌঁছে দিতে। বিশ্বাস তাদের নিজস্ব অধিকার। সেখানে আমার পছন্দ অপছন্দের পরিসর নেই। আমি খুদাই খিদ্‌মতগার।

২৪.০৩.২০২৫ তারিখে অর্থাৎ এই চৈত্র, ১৪৩১ সংখ্যায় ই-বুক পার্থসারথির পাঁচ বছর পূর্ণ হল। সামনের মাসে অন্তর্জাল সংখ্যা পদার্পণ করবে ছ' বছরে। সামগ্রিক ভাবে ২০২৫ সাল পার্থসারথি পত্রিকার ৬৫ তম বর্ষ পূর্ণ করে ৬৬ তম বর্ষে পা রাখার বছর। কোভিডের কল্পনাতীত দিনগুলিতে রূপান্তর হয়েছে সামাজিক চিন্তার, রূপান্তর হয়েছে পার্থসারথি পত্রিকার প্রকাশ মাধ্যমের। জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত যে পত্রিকা ছিল কাগজের বই, এপ্রিল ২০২০ থেকে সেটা হয়ে গেছে ডিজিটাল ফাইল।

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী পার্থসারথির পথ ঊষর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। অর্থের সমস্যা প্রবল ছিল এক সময়ে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশনার কারণে অর্থনৈতিক সমস্যা এখন মুখ্য নয়। এখন অভাব ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ উভয় বিষয়ে বর্তমান যুগের উপযোগী প্রবন্ধ রচনা করার মত মননশীল লেখকের।

ভারতীয় উপমহাদেশে হাজার হাজার বছর ধরে প্রসারিত হয়েছে সনাতন ধর্ম যা বিশ্বে অধিক পরিচিত হিন্দু ধর্ম নামে। এ' পর্যন্ত জ্ঞাত তথ্য অনুসারে হিন্দুধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম। মহাসাগর ও গিরিরাজির স্নেহবেষ্টনে লালিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ও তৎসন্নিহিত বিশাল অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন মত পথ সংস্কৃতির মানুষের শতাব্দীর পর শতাব্দী সহাবস্থান, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও মেধার বিনিময়ের ফলে সিন্ধুনদীর অববাহিকায় সঞ্জাত হিন্দুধর্ম ক্রমে যেমন হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় অসংখ্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও রীতিনীতির একটি মানবতাবাদী সংমিশ্রণ, অপরদিকে আধুনিক পৃথিবীতে বিবিধের মাঝে মহান মিলনের দার্শনিক ক্ষেত্র।

হিন্দুধর্মের কোন একক প্রবর্তক নেই, কোন কেন্দ্রীয় মতবাদের কর্তৃত্ব নেই। অনেক গবেষক হিন্দু শব্দটিকে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেন না। এই ধর্মের গবেষণায় চারটি প্রধান ঐতিহ্য ব্যবহৃত হয় – বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম ও স্মার্তবাদ। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তারা হেনোথেইস্টিক - সর্বোচ্চ ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েও দেবদেবী সম্পর্কিত অন্যান্য ধারণাকে অস্বীকার করে না।'

বর্তমান পৃথিবীতে নিজের নিজের ধর্মের প্রসারের নামে চলছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, নির্মম আগ্রাসন। ধর্মের মূল কথা মানবতা। কিন্তু ধর্ম প্রচারের আড়ালে কয়েক শতাব্দী ধরেই বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার। হিন্দুধর্মের এটাই স্বাতন্ত্র্য যে, যুগে যুগে এখানেও মালিন্য আসে, আত্মবিস্মৃতি আসে, আত্মচ্যুতি আসে, কিন্তু এই ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নয়, তাই প্রতিযুগেই এই মহান ভূমিতে আবির্ভূত হন মনীষীরা যাঁরা গ্লানিমুক্ত করেন ধর্মকে, রক্ষা করেন বৃহত্তর মানব সমাজকে।

DO NOT COPY

পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণের অবসান, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমন – জাতীয় বিপর্যয়ের ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে যখন ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, পথে পথে সর্বস্ব হারানোর হাহাকার, ধূল্যবলুণ্ঠিত মূল্যবোধ, সেই সময় ঋষি অরবিন্দের অনুগামী শ্রীপ্রীতিকুমার গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন গীতা প্রচার কেন্দ্র, প্রবর্তন করেন 'পার্থসারথি' ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা। আমৃত্যু তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ও শ্রী অরবিন্দ-মার্গের সাধক শ্রী অনিলবরণ রায়।

পার্থসারথি বিশ্বাস করে – যত মত, তত পথ। আমরা সেই ধর্মের সমর্থক – যে ধর্ম মানুষের পাশে মানুষকে দাঁড়াতে শেখায়, মানব সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়, হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের ঐতিহ্য বহন করে।

শ্রী প্রীতিকুমারের তিরোধানের ৩৯ বছর পরেও পার্থসারথির প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, রাজ্যব্যাপী ছাপাখানায় ধর্মঘট - কোন কিছুতেই গত ৬৫ বছরে এই পত্রিকার প্রকাশ রুদ্ধ হয় নি।

আগামী প্রজন্ম শ্রীপ্রীতিকুমারের আদর্শকে আরো প্রসারিত করবে এ আমার বিশ্বাস।

জয়তু শ্রীপ্রীতিকুমার! জয়তু পার্থসারথি!!

"মনটি দুধের মতো। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মন রূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হলো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না – সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে। "

- শ্রীরামকৃষ্ণদেব

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

দীর্ঘ দু'মাস পর কাগজ কলম ধরলাম। মাঝে ক'টা দিন আর. জি. কর হসপিটালে কেটে গেল। আমি নিজেও ভাবিনি বৃদ্ধকালে আমার এ' ধরণের একটা অপারেশন হবে। খুবই কাহিল হয়ে গেছি।

গেছিলাম উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষ্যে। আগে কোনওদিন কোনও তীর্থস্থানে একসাথে দশ এগারো দিন থাকি নি। এবার যাবার ব্যবস্থা চাকরীর কারণে উল্টে পাল্টে গেছিল। বাইরে যাবার কথা ২৯শে এপ্রিল (১৯৯২)। একটি বিশেষ কারণে ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলেজে উপস্থিত থাকা খুব দরকার ছিল। শ্রদ্ধেয় তপনদা (ডঃ তপন চক্রবর্তী) বলেছিলেন, "শুক্লাদি, দেখবেন আপনার ঐদিন কাজটা হবেও না, ওদিকে যাওয়াও হবে না।" পুত্তর বলল, "আমার চাকরীর ব্যাপার হলে আমি যেতাম না।" অগত্যা টিকিট ফেরৎ দেওয়া, রিজার্ভেশন বাতিল। বাইরে যাবার কথা হলে, না গেলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। আর আমি তো গত ৩৬ বছরে সারা ভারতবর্ষ নেপাল ছুটে বেড়িয়েছি। কিছুদিন না বেরোলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। তাই আবার চেষ্টা করলাম ইন্দোর অথবা ভূপাল যাবার। কাটনী পর্যন্ত টিকিট পেলাম। সেখান থেকে আবার রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে ভূপাল। চার ঘন্টা দেরীতে ভূপাল পৌঁছোবার পর আবার কোচ বদল। এবার উজ্জয়িনী যাবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। উঠলাম অন্য গাড়ীতে। এবারের যাত্রা মনে রাখবার মতো। মনে হল মাথা, কাঁধ, হাত, কোমর ধরে লোক ঝুলছে। দীর্ঘ ৬ ঘন্টা হাত পা নাড়ানো যায়নি। জল পর্যন্ত পান করা যায় নি, অন্য খাবার তো দূরের কথা। সমস্ত হাত পায়ে ব্যথা। গলা শুকিয়ে কাঠ। তার উপর তিন জনের মাল দুজনে বওয়া। তবু আমার জিদে আসা। তাই মোটামুটি সহ্য করে নেবার চেষ্টা করছিলাম। দু রাত পার করে তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় পৌঁছলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। বাপীকে বলেছিলাম একটা হোটেলে উঠতে। অন্তত বাথরুম, পাখা তো পেতাম। কিন্তু পিল পিল করে যত লোক

DO NOT COPY

উজ্জয়িনীতে নামলো, আর ভরসা করলাম না হোটেলে উঠতে। মনে হল অন্তত সেই নিরাপদ আশ্রয়ে যাই, যেখান থেকে আমি তীর্থযাত্রা শুরু করেছি ১৯৮৬ সাল থেকে।

নির্দেশানুযায়ী ঠিকানা খুঁজে বের করলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের। তখন আর মুখ দিয়ে কথা সরছে না, হাত পা চলছে না। চেনা মুখটি সামনেই পেলাম। তিনি যে আবার সঙ্ঘের কুম্ভমেলা ক্যাম্পের ইন-চার্জ, আমাদের জানা ছিল না। আর ও রকম বর্ণচোরা আম তো এ' যুগে বিরল। সবচেয়ে ভালো লাগলো যখন দেখলাম গণেশ মহারাজজীকে (স্বামী মহানন্দজী)। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো আমাদের টেন্ট-এর নং পাঁচ। জিনিসপত্র নিয়ে ভেলু ও কিষাণ টেন্টে পৌঁছে দিলো। বাপী ও সোমা স্বামী বিবিদিষানন্দজী মহারাজের কাছে বসে রইলো। আমি একটু উঁকি মেরে শিপ্রা নদীর অবস্থান জেনে নিয়েছি। পুণ্যের লোভ আর সামলাতে পারলাম না। টুক করে পন্টুন ব্রিজ পার হয়ে স্নানের ঘাটে চলে গেলাম। ব্রিজটা দেখে আমার এলাহাবাদের প্রয়াগের কথা মনে পড়ে গেল, তবে তার মধ্যে একটা বিশালতা ছিল। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো ছিল। এখানে সব ছড়ানো ছিটোনো মনে হল। ধূ ধূ করছে মাঠ। একসাথে অনেক তাঁবু। মাঝে মাঝে রাস্তা। এক এক আশ্রমের এলাকা টিন দিয়ে, বেড়া দিয়ে ঘেরা। সবচেয়ে যা চোখে পড়লো তা হলো তাঁবুর থেকে শৌচালয় বা মূত্রালয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। এলাহাবাদে যে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ বা দুর্গন্ধ একেবারেই ছিলো না এখানে তা বিরল।

রাতটি তো শান্তিতে কাটলো। বাইরে কোনও খাবার জায়গা নেই। বহু অন্নছত্র আছে। কিন্তু সাধুদের মত দণ্ড হাতে নিয়ে, পাত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হওয়া তো অভ্যেস নেই। কোনও দোকান নেই দু-একটি চায়ের দোকান ছাড়া। অগত্যা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভরসা।

সেই রাতে ক্লান্ত ছিলাম। ইন-চার্জ মহারাজের তাঁবুর সামনে বসে বসে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা শুনলাম। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মন

ছিলো আহারের দিকে। তার জন্য যে এত শাস্তি জানা ছিলো না। প্রথমে স্বামীজী ব্রহ্মচারী ও ভলান্টিয়ারদের ভোজনের ব্যবস্থা। তারপর উজ্জয়িনীর বাঙ্গালী কলোনীর অতিথিদের ভোজন। সে যে কত বাঙ্গালী চিন্তা করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের খাওয়া শেষ হতে মধ্যরাত্রি। অগত্যা .....। কাছে কোনও দোকানও নেই। তাই শুধু ঘুমে ঢোলা ছাড়া আর গতি কি? শ্রীপ্রীতিকুমারের খাবার ব্যবস্থা আমাদের সাথে। বাপী ও আমি একসঙ্গে গেছি। তাই তিনিও আমাদের সাথে। ভদ্রলোক এবার প্রায় অনাহারে কাটিয়েছেন। অথচ বাড়িতে তাঁর কি রাজসিক আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা ! এবারকার মত কষ্ট তাঁর কোথাও হয় নি। সকাল হল। মোটামুটি শহরটি দেখতে বেরোলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন ধূলাপায়ে দেব-দেবী দর্শন করতে। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহাকালেশ্বর শিব। ভাবলাম দর্শন করে আসি। যা লাইন দেখলাম চিন্তা করা যায়না। আমাদের বাড়ি থেকে হাওড়া ষ্টেশন প্রায় ! হরসিদ্ধিদেবীকে দর্শন করে ফিরে এলাম। পথে শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দজীর দর্শন হল। ইচ্ছে হলো তাঁর চরণ স্পর্শ করবার। ও বাবাঃ! তিনি পূজায় বসেছেন। দূর থেকে টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। অপেক্ষা করেই আছি কখন পূজা শেষ হয়। দেখি টেবিলে শিবলিঙ্গ আছেন, নাগরাজ আছেন, ফুল-মালা সব আছে। তিনি মিটি মিটি তাকাচ্ছেন আর ছোট্ট চামচ (নাম জানি না) করে জল সিঞ্চন করছেন। আমার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হল কিন্তু পূজা শেষ হলো না।

স্বামী স্বরূপানন্দজীর চরণস্পর্শের আশা ত্যাগ করতে হলো। দেখলাম ৩০০/ ৪০০ টাকায় স্ফটিকের মালা বিক্রি হচ্ছে। সে লোভও ত্যাগ করলাম কারণ গরম । ঐ ১০টা – ১১টার সময়েই প্রাণ যায় যায়। পালিয়ে এলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। শুনলাম বিকেলে আবার ধর্ম-মহাসম্মেলন হবে। দশজন মহামণ্ডলেশ্বর আসবেন। আসবেন রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া। সঙ্ঘে দারুণ তৎপরতা। খুব ডেকরেটিভ হয়েছিল ব্যবস্থাপনা। আমার সবচেয়ে মজা লাগছিল, যখন দেখছিলাম ইন-চার্জ মহারাজ নীরবে ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিচ্ছেন। মুখের অভিব্যক্তি সেই

১৯৫৬-৫৮ সালের মতো। মুণ্ডিত মস্তক ছাড়া গত কয়েক বছরে চেহারার পরিবর্তন দেখি নি, এবার একটু যেন ক্লান্তি (বার্দ্ধক্য?)-র ছায়া দেখলাম। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দজী গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে সব দিকে ছুটোছুটি করছেন। বড় দিলীপ মহারাজও খুব ব্যস্ত। আর কাউকে আমি বিশেষ জানি না।

দুপুরে আহারের সময় আসন্ন। সবাই যেন একটি ম্যারাথন রেস-এ অংশ নেবার ভূমিকায় আছেন। আমি সোমা ও বাপী ফেল। বসে রইলাম। ইন-চার্জ স্বামীজী বললেন, "একঘন্টা দেরী হবে, রান্না হচ্ছে। " সব যাত্রীর খাওয়া না হলে তিনিও খেতেন না। পুরী বা কাশীতে এটা দেখিনি। যাইহোক আহার জুটলো দু'টো নাগাদ। টেন্ট-এ ঢোকার অবস্থা নেই। গা হাত জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীপ্রীতিকুমারের স্টীলের থালা ফেটে গেলো। টুথ পেস্টের টিউব ফেটে গেলো। যাতে হাত দিই, হাত পুড়ে যায়। অগত্যা বেরোনই ঠিক হলো। আমরা তিনজন গেলাম বড় রাস্তার দিকে, যেখানে সার দিয়ে নিরঞ্জনী আখড়া থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সন্ন্যাসীদের আখড়া তৈরী হয়েছে। কি রাজসিক ব্যবস্থা! কি সুন্দর ডেকরেশন! কি বিশালতা! চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। খুঁজে খুঁজে গেলাম ১০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে। তাঁকে প্রথমে চিনতে পারিনি কারণ মুখে সেই পরিচিত দাড়ি নেই। গরমে কাহিল। নতুন প্রকাশিত গীতা (শ্রীপ্রীতিকুমার অনূদিত, নবতম সংস্করণ) উপহার দিলাম। ওঁর নিজের কথা শুনলাম। কি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। গাড়ী করে করে আজ দিল্লী কাল বোম্বাই করতে হয়, সময় পান না। আমার স্বামী শিবানন্দ গিরিজীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও ১০৮ তম মহামণ্ডলেশ্বর হয়েছিলেন ঐ ভোলাগিরি আশ্রমের (বোধহয়)। কি সুন্দর চিঠি লিখতেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনে আমাদের দমদমের বাড়ীতে এসে তাঁর বিছানা স্পর্শ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। পরের বার ১০ই মার্চ, '৮৮-তে আগরপাড়া ভোলাগিরি স্নেহনীড়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বলেছিলেন, "ঐ দিন আমি হব হোস্ট, তোমরা আমার গেস্ট"। তার অল্পদিন পরেই চলে গেলেন। এটা আমি নিজেরই দুর্ভাগ্য মনে

করি। অত অল্প বয়সে কি ডায়নামিক ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। এরপর পরিচিত হয়েছিলাম স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজীর সাথে শ্রীপ্রীতিকুমারের স্ত্রী হিসাবে; গীতাজয়ন্তীতে কি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, কত যত্ন করে প্রসাদ খাইয়েছিলেন। উজ্জয়িনীতে তিনি খুবই ব্যস্ত। ওই ফাঁকে আমাদের লাড্ডু প্রসাদ দিলেন। যেমন তার সুগন্ধ, তেমন তার স্বাদ। লজ্জায় আর চাইতে পারলাম না। ১৬ই মে মহাস্নানের (শাহীস্নান) পর তাঁর আশ্রমে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রণাম করে ফিরে চললাম। আবার সেই রাজপথ। সার দিয়ে আশ্রম। সবচেয়ে অবাক লাগলো আগরওয়ালা জল বিতরণ কেন্দ্রের কাজ দেখে। কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা যাত্রী – পথচারীদের ঠাণ্ডা পানীয় জল বিতরণ করে যাচ্ছেন সারা দিনরাত – তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এবার এসে পৌঁছলাম অমরকণ্টকের কল্যাণেশ্বর স্বামীজীর আশ্রমে। আমাদের অনুরাধাদি, তপন দা এখানেই আছেন। সোমার নতুন জুতো দুখণ্ড, ঐ গরমে হেঁটে। ওরা দুজন চলল মুচীর সন্ধানে। আমি অনুরাধাদির কাছে। দেখা হল। গরমে সবাই কাতর। অনুরাধাদি তাঁর গুরুদেবকে দর্শনের জন্য আমায় নিয়ে চললেন। এত বছরে তাঁকে দর্শন করার ভাগ্য আমার হয় নি। বোধহয় স্নান করে বেরিয়েছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাতে বেশ ঠাণ্ডা লাগলো। ৫১ টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার বলেছিলেন সাধু সন্ন্যাসীদের শূন্য হাতে প্রণাম করতে নেই। সেকথা মেনে চলবার চেষ্টা করি। দেখলাম সাধুজীর হাতে একটি সুন্দর ব্যাগ। নিজেই টাকাটি কুড়িয়ে ব্যাগে রেখে দিলেন। অনুরাধাদি বললেন হিন্দীতে, "বাবা, আমার বন্ধুকে একটু আশীর্বাদ করলেন না?" উনি টুক করে আমার মাথায় হাত রেখেই মূল মণ্ডপের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন যেখানে একটি অনুষ্ঠান শুরু করবার কথা ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে শুনে শুনে হিমালয়ের সাধুদের সম্বন্ধে আমার সামান্য ধারণা ছিল। শ্রীকল্যাণেশ্বর বাবাকে দেখে আমার সেই ধারণা কিছুটা মিলে গেলো। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, এত বছর ঘর করেও, এত কাছে

থেকেও আমি অমন একজন সাধককে সাধকের মত না দেখে নিজের দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য চিৎকার করে মরেছি – আজ সেকথা মনে করে খুব অনুতাপ হয়।

যাক! বিকালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ফিরে ধর্ম সম্মেলন দেখলাম। ধর্মক্ষেত্রের পুরোধারা এসেছিলেন। কি তাঁদের বক্তৃতা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো নিরঞ্জনী আখড়ার মঠাধ্যক্ষকে। খুব কম বয়স মনে হল। সঙ্গে রীতিমত দু'জন প্রহরী, দু'পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। শুনেছি তিনি খুবই পণ্ডিত। এবং তাঁর কথাগুলি দাঁড়িয়ে শোনার মত। স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজীও এসেছিলেন। তিনি হিন্দীতে শুরু করে বাঙলায় শেষ করলেন। বিশ্বে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্পে সকলেই দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন।

এর মধ্যে এসে পড়লেন মহারাণী বিজয় রাজে সিন্ধিয়া। একটা ব্যস্ততা দেখা গেলো। একটি মেয়ে উঠে তাঁকে মাল্যদান করল। অন্যক্ষেত্রে স্বামীজীরা মাল্যদান করছিলেন। মেয়েটি রাণীজীকে হাত পাখার হাওয়া করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত রাণীজী নিজেই পাখাটি নিয়ে নিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখনই লোডশেডিং হয়ে গেলো। গলদ্‌ঘর্ম রাণীসাহেবা বক্তৃতা দেবার আগেই উঠে চলে গেলেন। একজন বৃদ্ধ বেশ জোরেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন – এরা সব জনগণের পাশে দাঁড়ানো সাংসদ? কিন্তু জনগণের সঙ্গে গরম ভোগ করতে একেবারেই পারেন না। অন্যরা বিব্রত হয়ে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। এসব না দেখলে জ্ঞান বাড়তো না।

উজ্জয়িনীতে যাবার আগে থেকেই পুত্তরের সঙ্গে বিনা কারণে মতবিরোধ চলছিল। দুজনের সমান গোঁ। আমিও স্থির করেছিলাম ফিরে এসে একটা বাড়ী দেখে চলে যাবো। এ' সংসারে আর থাকবো না। উজ্জয়িনীতে মহারাজকে সব বলতে তিনি আমাকে সুশিক্ষাই দিলেন। শ্রীপ্রীতিকুমারের পর আমি এঁর কথা শোনবার চেষ্টা করি। অবশ্য বিপদে পড়লে পুত্তরের কথাও শুনি। বাপের ধারা ও অনেকটাই পেয়েছে। উজ্জয়িনীতে বললাম, "মহারাজ, এ ঝগড়া তো আর সহ্য হচ্ছে

না। যোগশক্তি এপ্লাই করো, শান্তিতে থাকতে দাও।" মহারাজ কি করলেন জানি না, উজ্জয়িনী থেকেই শান্তি বহাল আছে। এখন বোধহয় তার ধারণা হয়েছে মা শত্রু নয়।

যাক! এর মধ্যে একদিন বেড়াতে গিয়ে সামান্য খিটিমিটি। সোমা বেচারার মহা মুস্কিল। ওকে বলি – "আমার সাথে যেতে হবে না, বাপীর সাথে যা --", বাপী বলে, "মার সাথে যাও --"। শেষে মহাকালের মন্দিরের দিকে যাওয়া হল। সে কি বিরাট লাইন! আমার মেজাজ তখনও গরম। মহাকালকে বললাম, "তুমি যদি সাক্ষাত শিব হও আজ রাত্রে আমার মৃত্যু দাও --"। মূল মন্দিরে যখন প্রবেশ করলাম অপূর্ব লাগলো। পূজা দেওয়া হলো, বেল্লাতা দেওয়া হলো। তখন রাগ সব ভুলে গেছি। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সিঁড়িতে আমার পুত্তর দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরে মেয়ে ও ছেলেদের লাইন আলাদা। বাইরে বেরিয়ে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও পুত্তর না আসাতে চিন্তিত হলাম। পরে যখন এলো, শুনলাম অদের ছেলেদের লাইন পুলিশ আটকে দিয়েছিল। আমি তাহলে অকে দেখলাম কেন সাথে সাথে? এ প্রশ্ন আজও মনের মধ্যে আছে। আমার ইচ্ছেটা আমি উইথড্র করে নিয়েছিলাম। যাইহোক, সেরাত্রে পেটে একটা কেমন ব্যথা করে। সোমাকে বললাম আমার পেটে একটা নতুন কিরকম ব্যথা করছে। সেটা খুব বেশী গায়ে মাখিনি। মাঝে ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করে এসেছিলাম। বাকী ক'টা দিন শিপ্রা নদীর রামঘাটে মাঝে মাঝে স্নান করে আসছিলাম। এত লোকের ভিড়, বিশেষ করে এত অপরিচ্ছন্ন লোকেদের দল যে রাস্তায় আর বেরোতে ইচ্ছে করছিল না।

ওখানে কিছু বই পড়তাম, গান শুনতাম, আর দু' চোখ ভরে শুধু জনতার মেলা দেখতাম। আমাদের ফেরার টিকিট ছিল ইন্দোর থেকে ২২শে মে। কিন্তু ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজীরা ক্যাম্প গুটিয়ে ১৮ই মে উজ্জয়িনী স্পেশাল ট্রেনে কোলকাতা আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরাও সেই সঙ্গে ফিরে আসা স্থির করলাম। ১৮ই মে রাত্রে আমরা রওনা হলাম। ২১শে মে সকালে হাওড়া পৌঁছলাম।

মারাত্মক যন্ত্রণাময় রাতটি ছিলো ১৯শে মে। সে যে কি যন্ত্রণা আর বমি, বলে বোঝানো যাবে না। বাপী ও সোমা কি সেবাটাই না করলো ! সারা ট্রেন-এর লোক ছেলেকে "মাতৃভক্ত" আখ্যা দিল। ২০ তারিখ ভোরে আমাদের ইন-চার্জ স্বামীজী একবার এসেছিলেন। বিধান দিয়ে গেলেন রেল লাইনে নেমে ওই পাইপের জলে স্নান সেরে নিতে। পরে আরেকবার এসেও ঐ বিধান দিলেন। শেষ পর্যন্ত পুত্তর ৮টি বগী ডিঙ্গিয়ে ওঁদের কাছ থেকে ২টি বালতি নিয়ে এলো। সেই জলে স্নান সারা হলেও কোনও আহারের ব্যবস্থা করা যায় নি। ট্রেন তার ইচ্ছেমত চলছে। যেখানে থেমে যায়, আর নড়ে না। শেষ পর্যন্ত মোগলসরাই ষ্টেশনে ১৫ টাকা দিয়ে একটি পাকা পেঁপে কেনা হলো। ঐ ছিলো সারা দিনের খাদ্য। শ্রীপ্রীতিকুমারকে তাই দেওয়া হলো। ২০ তারিখে রাত্রে আবার ব্যথা। সে প্রায় জীবন যায়। বাপী দু'রাত ঘুমায় নি। আর ডেকে বিরক্ত করলাম না। তিন খানা ঘুমের ওষুধ একসাথে খেয়ে নিলাম। কিসের কি? কোনও লাভই হলো না। তখন বিপদে পড়ে আর শ্রীপ্রীতিকুমারকে ডাকাডাকি করতে ইচ্ছে হয়নি। নিজেই তো মৃত্যু চেয়েছিলাম রাগ করে। উইথড্র করি আর না করি, একটু যন্ত্রণা তো সহ্য করতে হবেই। ২১ তারিখ সকালে হাওড়া। দেখলাম আমাদের স্বামীজী খুব ব্যস্ত। ইশারায় বললাম – যাচ্ছি। গণেশ মহারাজকে প্রণাম করাতে সে চির পরিচিত হাসিটি দিয়ে বললেন, "কি চিন্তায় ফেলেছিলে মা!" প্রাণ্টা ঠাণ্ডা হলো। বাড়ী ফিরলাম প্রশান্ত চিত্তে। তখনও জানি না আমার জন্য অপারেশন টেবিল অপেক্ষা করে আছে। রবিবারে আবার বমি ও যন্ত্রণা। ডাক্তারবাবুর (ডঃ এন কে কুণ্ডু) আগমন ও বিধান – এপেন্ডিসাইটিস। তখন আমার শনি, রাহু, মঙ্গলের দশা ও অন্তর্দশা চলছে। ৩১.০৫.৯২ পর্যন্ত ঐ দশা। অপারেশনটাকে এড়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ডঃ অজিত নান দেখামাত্র বলে দিলেন – "কালই হসপিটালে ভর্ত্তি হবেন, ইমিডিয়েটলি অপারেশান দরকার।" বাপী একটু ক্ষুন্ন হলো। ওর ধারণা ছিল ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অনিমা আমার ছোট্টবেলার বন্ধু। ও আমার মুখ দেখেই বললো, "তোকে অপারেশান করাতেই হবে, না করলে গ্যাংগ্রীন হয়ে যাবে।" অগত্যা আর জি কর

মেডিকেল কলেজ। বাপী জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ডঃ নান-এর নার্সিং হোমে ভর্তি হতে চাও?" আমার মনে পড়লো ১৯৮৩ সালে শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা, "আমার নার্সিং হোমে দেবার মত ক্ষমতা থাকলেও অনিমাকে আমি ওভারটেক করতে পারবো না।" – সে কথা অগ্রাহ্য করিনি। আর অনিমা এবার যা করলো তা না লিখলে অনেক জিনিস অজ্ঞাত থেকে যাবে। হসপিটালের বর্ণনা পরের বার।

(** রচনাকাল – জুলাই, ১৯৯২)

দেব-রূপান্তর **শ্রী অরবিন্দ**

দিব্য রূপান্তরের অর্থ এই নয় যে মানবীয় উপাদানগুলিকে বিনষ্ট করতে হবে। দেব-রূপান্তরের অর্থ মানবীয় উপাদানগুলিকে গ্রহণ করে তাদিকে পরিপূর্ণতার পথ দেখিয়ে দেওয়া। পবিত্র এবং পূর্ণ করে তাদিকে তাদের সম্যক শক্তি এবং আনন্দের মধ্যে উত্তোলিত করতে হবে, এবং তার অর্থ সমগ্র পার্থিব জীবনকে তার পূর্ণ শক্তি এবং আনন্দের স্তরে উত্তোলিত করা।

মানবীয় প্রাণ ও প্রকৃতির মধ্যে যদি প্রতিবন্ধকতা না থাকতো, পরিবর্তনের পথে বাধা যদি না দিত সেই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি যারা দোষত্রুটি এমন কি বিকৃতির মধ্যে আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে এই পরিবর্তন সাধিত হতো বিনা সঙ্কটে, ব্যথা বেদনাহীন স্বাভাবিক প্রস্ফুটনে।

জীবনের দিব্য রূপায়নের অর্থ বৃহত্তর জীবন পদ্ধতি। অহমিকা ও অজ্ঞানতা প্রসূত বর্তমান জীবনধারা নীচ, রূঢ় এবং অসম্পূর্ণ। আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক উন্মুক্তি এবং সংস্কৃতির দ্বারাই মানবজীবন সম্যক সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তা হতে পারে কেবলমাত্র যদি মানবজীবন দিব্য আলোকে এবং দিব্য শিখায় নিষিক্ত হয় যাঁহার দ্বারা তার উপাদানগুলি খাদমুক্ত হয়ে পবিত্র ধাতুতে পরিবর্তিত হবে।

DO NOT COPY

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে অন্ধকারাবৃত অসমনীয় বাধা রয়েছে। সেই কারণেই প্রয়োজন হয়েছে নেতিমূলক প্রক্রিয়ার। সাধনার বিরুদ্ধে যা দাঁড়াবে তাকে বর্জন করতে হবে। যে গঠন অমার্জিত বা অনাবশ্যক তার উপর চাপ দিয়ে তাকে দূর করতে হবে। আর যে সব উপাদান প্রয়োজনীয় কিন্তু অসম্পূর্ণ বা বিকৃত তাদিকে রাখতে হবে এবং তাদের সত্যরূপ দিতে হবে। ঐ ধরণের চাপ প্রাণসত্তার কাছে বেদনাদায়ক, কারণ উহা অন্ধকারে আবৃত থাকে তাই সে নির্বোধ। আর প্রাণসত্তার মধ্যে এমন সব অংশ আছে যারা তাদের অমার্জিত গতিবিধি নিয়েই থাকতে চায়, কোন পরিবর্তন চায় না। সেই জন্যই চৈত্যসত্তার মধ্যস্থতায় বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। চৈত্যপুরুষের আছে আনন্দময় নির্ভরতা, তৎপর বোধশক্তি, সত্বর উত্তর এবং স্বয়ংকৃত আত্মসমর্পন। আমাদের চৈতন্যময় সত্তায় আমরা উপলব্ধি করি যে গুরুর স্পর্শ আসে সাহায্য করতে, আঘাত করতে নয়। রাধার মতন আমাদের চৈতন্যময় সত্তা জানে যে প্রিয়তম যা কিছু করে তা দিব্য আনন্দে নিয়ে যাবার জন্যই।

আবার নেতিমূলক দিকটি দেখেই যোগসাধনার বিচার করা বিধেয় নয়। ইতিমূলক দিকটাও দেখা প্রয়োজন। কারণ নেতিমূলক দিকটা সাময়িক এবং পরিবর্তনীয় তাই তার অবসান হয়। আদর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য ইতিমূলক দিকটাই ধর্তব্য। যদি কেহ নেতিমূলক দিকটাই লক্ষ্য করে, এবং পরিবর্তনীয় পদ্ধতিটিকেই ভবিষ্যতের বিধান রূপে ধরে নেয় এবং যোগের প্রকৃতির নির্দেশক মনে করে তাহলে এক বিরাট ভুল করবে সে, তা এক মারাত্মক ভুল হবে। এই যোগ মানবজীবনকে বর্জন করে না, ভগবান এবং সাধকের মধ্যে আন্তরিকতাকেও নিষিদ্ধ করে না। এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকেও ভগবানের সহিত একান্ততম নৈকট্যই এই যোগের আদর্শ। দিব্য বিশালতা, দিব্য পূর্ণতা এবং জীবনের দিব্য আনন্দই এই যোগের লক্ষ্য। **

** শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

স্বামী বিবেকানন্দ 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী' পুস্তিকায় লিখেছিলেন, "শ্রী ভগবান এখনও রামকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে এখনও সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদাশ পাইয়া থাকেন এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতে পারেন।" এ কথার অর্থ নরলীলায় অবলম্বিত স্থূল দেহ পরিত্যক্ত হলেও শ্রী ভগবানের লীলাবিগ্রহ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, অনন্তকাল ধরে সে চিন্ময় বিগ্রহ ভক্ত সঙ্গে লীলা করে থাকে। জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে অথবা মনের ব্যাকুল অবস্থায় ভক্ত সন্তানেরা ভগবানের দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময় লীলা বিগ্রহ কত ভক্ত দর্শন করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মা সারদা প্রায় ৩৪/৩৫ বছর সশরীরে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি বহুবার ঠাকুরের দর্শন ও উপদেশ লাভ করেছিলেন। মহাসমাধির পরের দিন যখন মা গভীর শোকে আচ্ছন্ন তখন ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। মা নিজের মুখে বলেছেন, পরদিন আমি হাতের বালা খুলতে যাচ্ছি, তিনি খপ করে আমার হাত দুটো ধরে বললেন,- আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর। শোনা যায়, মা বৃন্দাবনে আর একবার হাতের বালা খুলতে গিয়েছিলেন। সেবারও ঠাকুর মাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি হাতের বালা খুলো না; গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও - কৃষ্ণ পতি যার তার বিধবা হওয়া নেই, সে চির সধবা"। গৌরী মার সঙ্গে দেখা হলে মা তাঁকে ঠাকুরের কথা বলেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করে মাকে সব বুঝিয়ে দেন। গৌরী মা ঐ সময় বৃন্দাবনের কোন স্থানে তপস্যারত ছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে তিনি মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মার মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁকে তীর্থভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃন্দাবনের পথে মা অভাবনীয় রূপে আর একবার

ঠাকুরের দর্শন লাভ করেছিলেন। অসুখের সময় ঠাকুর নিজের ইষ্টকবচ মাকে দিয়েছিলেন। মা ঐ কবচ নিজের হাতে ধারণ করে যথাবিধি পুজো করতেন। রেলগাড়িতে মা কবচ সুদ্ধ হাত জানলার উপরে রেখে শুয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন ঠাকুর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, "ওগো, হাতে সোনার ইষ্টকবচ এমন করে রেখেচ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে"। মা তখন তাড়াতড়ি উঠে হাত থেকে কবচ খুলে বাক্সে রেখে দেন।

বৃন্দাবনে অবস্থান কালেই ঠাকুর মা'কে দেখা দিয়ে স্বামী যোগানন্দকে ইষ্টমন্ত্র দিতে বলেন।

মা আরো বহুবার ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন। ঠাকুর মা'কে কামারপুকুরের বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। মায়ের আবার গঙ্গা বাই ছিল। হয়ত মনে মনে ভাবছিলেন কি করে গঙ্গাবিহীন রাজ্যে বাস করবেন! এই সময় তিনি ঠাকুরের একটি তাৎপর্যময় দর্শন লাভ করেন। দেখলেন, ঠাকুর তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন এবং তাঁর পদতল থেকে গঙ্গা উত্থিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সঙ্গে বহু লোকজন ও কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত। নিকটস্থ একটি গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করে মা সেই পবিত্র প্রবাহে অঞ্জলি দিলেন। এই দর্শনের পর মায়ের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ঠাকুরই সব, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু এবং তাঁর পদযুগল থেকেই গঙ্গার উদ্ভব।

স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার আগেও মা ঠাকুরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দর্শন লাভ করেন। মা দেখলেন ঠাকুর গঙ্গার মধ্যে নেমে যাচ্ছেন। ভাবলেন বোধহয় স্নানের জন্য নামছেন, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যতই নামছেন ততই তাঁর দেহ গঙ্গাজলে মিশে যাচ্ছে। শেষে সমস্ত দেহ দ্রবীভূত হয়ে গঙ্গায় মিশে যাবার পর স্বামীজী সেই জল "জয় রামকৃষ্ণ" বলে চারপাশে সমবেত নরনারীর মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন।

DO NOT COPY

ঠাকুরের শরীর যাবার পর মায়ের সংসারে আর কিছুই ভালো লাগছে না, তখন ঠাকুর একদিন দেখা দেন। একটি দশ বারো বছরের মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "একে আশ্রয় করে থাকো, এটি যোগমায়া।"

মায়ের স্বরূপ বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর যোগেন মাকেও দেখা দিয়েছিলেন। যোগেন মা ভাবতেন, "ঠাকুর অমন ত্যাগী, কিন্তু মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন – ভাই ভাইপো, ভাইঝিদের জন্যে অস্থির। কিছুই বুঝতে পারিনে।" একদিন গঙ্গার ঘাটে নিবিষ্ট মনে যোগেন মা ধ্যান করছেন, এমন সময় ঠাকুরের অলৌকিক দর্শন লাভ করেন। দেখেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "দেখো, গঙ্গায় ওটা কি ভাসছে।" যোগেন মা দেখেন, একটি সদ্যোজাত শিশু নাড়ীভুঁড়ি জড়ানো অবস্থায় স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ঠাকুর পরিষ্কার ভাষায় বললেন, "গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়, না তাকে কিছু স্পর্শ করে ? ওকে তেমনই জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে আর একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ বলে জানবে।"

সবাই জানেন ঠাকুর স্বামীজীকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন। বস্তুতঃ কোন মানুষের পক্ষেই অতো গভীরভাবে কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়। ঠাকুরের শরীর গেলেও সে ভালবাসা শেষ হয়নি। দেশে বিদেশে সম্পদে বিপদে স্বামীজী সর্বদাই ঠাকুরের দর্শন পেতেন। স্বামীজীর বিশ্বজয়ের পর কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি যখন তাঁকে নগ্নভাবে আক্রমণ করছে, তখন উদ্বিগ্ন গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁদের চিন্তা করার কারণ নেই কেননা স্বয়ং ঠাকুর সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীজী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। একদিন রাত্রে উদ্যান বাটিতে তিনি বেড়াচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখলেন ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি। হয়ত চোখের ভুল মনে করে তিনি চুপ করেছিলেন, কিন্তু পাশেই যে গুরুভাই ছিলেন তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "নরেন্দ্র,

দেখ, দেখ!" তখন স্বামীজীর সংশয় কাটলো। তিনি বুঝলেন ঠাকুর শাশ্বত জ্যোতির্ময় দেহে দর্শন দেবার জন্যই এসেছেন। তিনি তখন সকলকে ডাকাডাকি শুরু করেন, কিন্তু তাঁরা আসার আগেই ঐ মূর্তি অদৃশ্য হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর) মহারাজের একদিনের স্মৃতিকথা থেকে স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুরের নিত্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ ভক্ত অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেনঃ দেখ অমূল্য, আমি এবং স্বামীজী তখন পরিব্রাজক অবস্থায় পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াই। একদিন উত্তরপ্রদেশে দুইজনেই পায়ে হেঁটে চলেছি। কিছুক্ষণ পরেই একটা ছোট বন দেখা গেল। সেই বন ভিন্ন অন্য দিক দিয়েও যাবার রাস্তা ছিল। স্বামীজী আমাকে বললেন, "গঙ্গা, তুই বনের বাইরের রাস্তায় যা, আমি বনের ভিতর দিয়ে যাই, দেখি কে আগে যেতে পারে।" আমি স্বামীজীর কথা শিরোধার্য করে বাইরের রাস্তায় রওনা হলুম। স্বামীজী বনের ভিতর দিয়ে চললেন। আমি যখন বনের ওপর প্রান্তে উপস্থিত হই তখনও স্বামীজী এসে পৌঁছন নি। মনে ভয় ও ভাবনা এলো – স্বামীজীকে একা একা আসতে দেওয়া আমার সঙ্গত হয় নি। অগত্যা বনের পথে বিপরীত দিক ধরে অগ্রসর হলুম, যদি স্বামীজীর দেখা পাই। কিছুদূর যেতে না যেতেই দূরে স্পষ্ট দেখতে পেলুম স্বামীজী শ্রীঠাকুরের গলা ধরে আস্তে আস্তে আসছেন। এই দৃশ্য দেখে আর না এগিয়ে আমি পিছন ফিরলাম। স্বামীজীও একটু পরেই এসে পড়লেন। তিনি বলেন, "গঙ্গা, এই যে তুই আমার আগেই এসে পড়েছিস।" আমি তাঁকে বললাম, "ভাই, আমি তো কারো গলা ধরে আস্তে আস্তে আসছিলাম না!" এই কথা বলতেই স্বামীজী হেসে বললেন, "তুই বুঝি দেখেছিস?"

মানসপুত্র রাখাল মহারাজের সঙ্গেও ঠাকুরের নিত্যলীলা চলত। একদিন মহারাজের ইচ্ছা মতো কাশীধামের জনৈক ভক্ত মহিলা ঠাকুরের নামে বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করেন। মহারাজ সহ মঠের সকলেরই সেখানে নিমন্ত্রণ। মহারাজ সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু কথা দিয়েও তিনি নিজে গেলেন না। তাঁর

এই আচরণের অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে নরোত্তমানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসী সেবক তাঁকে বলেন, "মহারাজ, আমরা শুনেছি, ঠাকুর প্রাণ দিয়েও সত্য রক্ষা করতেন, কিন্তু আজ আপনি এটা কি করলেন? মহিলাটি অসম্ভব আঘাত পেয়েছেন এবং নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছেন"। এরপর মহারাজ সেবককে বললেন, "নরোত্তম, তোর কথা আমি শুনলাম, এবার তুই আমার কথা শোন। আমি তো ওখানে যাবই ঠিক করেছিলাম। সব ছেলেরা চলে গেল। আমিও আস্তে আস্তে স্নান করলাম। স্নান করে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে চাদরটা গায়ে দিলাম। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে বললাম, "ঠাকুর ছেলেরা সব গেছে, এখন তাহলে আমিও যাই, আর ভোগের প্রসাদ খেয়ে আসি গিয়ে"। ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁরে রাখাল, তুই এতগুলো ছেলের মুখে খাবি। তোর গিয়ে দরকার নেই"। আমি তখন চাদরখানা খুলে ফেললাম। নরোত্তম, তুই এখন বিচার কর ঠাকুর যেমন সত্যের মর্যাদা দিতেন, ঠাকুরের কাছে সত্যই সব চাইতে বড় ছিল, আমার কাছে তেমনি ঠাকুরের আদেশই সব চাইতে বড়"।

স্বামী প্রেমানন্দ অর্থাৎ বাবুরাম মহারাজ সম্পর্কে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। ঠাকুর বলতেন-ও নৈকষ্য কুলীন, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। প্রকট কালে তিনি যেমন এই শুদ্ধ সত্ত্ব সন্তানটিকে সর্বদাই কাছে কাছে রাখতেন, অপ্রকট হবার পরও তিনি তাঁকে ঘন ঘন দেখা দিতেন। তৎকালে বেলুড় মঠে দুই শ্রেণীর সাধু ছিলেন- একশ্রেণী নিরামিষাশী ও অপর শ্রেণী আমিষাশী। শোনা যায়, নিরামিষাশীরা কোন কোন বিষয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করতেন। আমিষাশীদের একটু অবজ্ঞার চোখেও দেখা হত। একদিন ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে দেখা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, আমার ছেলেরা একটু মাছ খায়, সেজন্য এত কেন? ঠাকুরকে দর্শন করে এবং তাঁর কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ তো স্তম্ভিত। পরদিন নিজের হাতে মাছ কেটে এবং রান্না করে তিনি সকলকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ান।

তখন মঠের নবাগত সাধু ব্রহ্মচারীদের মধ্যে দু-একজন অবাধ্য ছিল। সস্নেহে উপদেশ দিয়েও যখন তাদের পরিবর্তন করা গেল না তখন বাবুরাম মহারাজ

মঠ ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করেন। মঠের মূল ফটকের কাছাকাছি এসে দেখেন ঠাকুর দুই হাত দিয়ে ফটক আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই ঠাকুর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, আমায় ফেলে তুই কোথায় যাচ্ছিস"? অগত্যা মহারাজকে মঠে ফিরে যেতে হল।

বাবুরাম মহারাজ যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করছিলেন তখন সিরাজগঞ্জে ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, "এখান থেকেই মঠে ফিরে যাও, আর বেশী ঘোরাঘুরি করলে শরীর থাকবে না"। ঠাকুরের এই সাবধান বাণী সত্ত্বেও তিনি নেত্রকোনা যান এবং ঢাকা বিক্রমপুর হয়ে মঠে ফেরেন, উদ্দেশ্য ভক্ত নীরদ সান্যালকে সুখী করা। কিন্তু ঠাকুরের কথা বিফল হবার নয়। তিনি অচিরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং নিরাময়ের পর পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর মাকে যেমন বলেছিলেন - আমি গেছি কোথায়? এই তো এঘর আর ওঘর। ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের মনে সহজেই সে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। তিনি অনুভব করতেন ঠাকুর সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। একদিন আশুবাবু নামে তাঁর অফিসের একজন অধস্তন কর্মচারী তাঁকে রোগ শয্যায় দেখতে এসে বলেন "ঠাকুর যদি এখন থাকতেন, তাহলে আপনার এই অবস্থায় কি করতেন?" কথাটা শুনে পূর্ণচন্দ্র বিছানায় উঠে বসে সতেজে বললেন, "তিনি গেছেন কোথায়?" অপ্রস্তুত হয়ে আশুবাবু তাঁকে ধরে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলে তিনি শান্ত হয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "দেখুন, কাল রাত্রে প্রস্রাব করতে বারান্দায় কোন রকমে দেয়াল ধরে গেছলাম। ঘরে অবশ্য লোক থাকে; কিন্তু সে ঘুমিয়েছিল বলে তাকে আর জাগাই নি। একাই ঐভাবে বারান্দায় যাই। কিন্তু ফেরার সময় উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, আর একটু হলেই পড়ে যেতাম। ঠিক সময় ঠাকুর এসে আমায় ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলেন"।

DO NOT COPY

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর ত্যাগী সন্তানদের অনেকেই কষ্টে আছেন, থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এই সময় একদিন সন্ধ্যায় পুজোর ঘরে বসে সুরেন্দ্র মিত্র একটি দিব্য দর্শন লাভ করেন। হঠাৎ দেখলেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে – তার আগে একটা ব্যবস্থা কর"। এই ঘটনার পর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ত্যাগী ভক্তদের একটি আস্তানার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের আশ্বাস দেন। সেই থেকেই মঠের সূত্রপাত।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' গ্রন্থের প্রণেতা ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত সুরেশ চন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসে সাকার সাধনায় শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। সাধু নাগ মশায় তাঁকে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি রাজী হন নি। নাগমশাই অবশ্য তাতে হতোদ্যম না হয়ে তাঁকে ঠাকুরের কাছে হাজির করেন। কথাবার্তায় তাঁর অনিচ্ছা বুঝে ঠাকুর বলেছিলেন, "তবে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নেই। পরে তুমি এর প্রয়োজন বুঝবে, সময়ে তোমার দীক্ষা হবে"। ঠাকুর যখন কাশীপুরে শেষ শয্যায় শায়িত তখন সুরেশ চন্দ্র দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হন কিন্তু ঠাকুরের ঐ অবস্থায় কিছু বলতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে ঠাকুর স্বধামে প্রয়াণ করেন। তখন সুরেশচন্দ্রের অন্তর অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। রোজ গঙ্গাতীরে বসে ঠাকুরকে স্মরণ করে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেন। এই সময় একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন ঠাকুর গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে এসে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা শেষে ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন, ঠাকুর নেই। তখন তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না যে ঠাকুরের প্রকট লীলা শেষ হলেও নিত্যলীলা চলছে।

বৃন্দাবনে যেমন নিত্য রাস চলে এবং ভাগ্যবানেরা তা দেখতে পায়, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলাও তেমনি অব্যাহত আছে, এবং বহু ভাগ্যবান সে লীলামাধুর্য আস্বাদন করছে।

ভীমার পাশে ভীমাশঙ্কর

শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য

২৮ রাজ্য আর ৮ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে যে ভারতবর্ষ তার মাত্র আটটিতে রয়েছে মহান জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দির। গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে দুটি করে আর ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশে একটি করে জ্যোতির্লিঙ্গের মন্দির থাকলেও সিদ্ধি বিনায়কের দেশ মহারাষ্ট্রে রয়েছে তিন তিনটি। এর মধ্যে ২০০৮-এ গৃশনেশ্বর আর ২০১৯-এ নাসিকের ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শন হলেও ২০২৫-এর জানুয়ারীর আগে ভীমাশঙ্কর দেখে ওঠা হয়নি – বার তিনেক পুণে ঘুরে যাওয়ার পরেও! অথচ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই ভীমাশঙ্করের মন্দির রয়েছে পুণে জেলারই ভীমাশঙ্কর গ্রামে। তাই কলকাতা থেকে সরাসরি এখানে পৌঁছাতে আসতেই হবে পুণে জংশন রেল স্টেশন অথবা দেশের নবম ব্যস্ততম এয়ারপোর্ট লোহেগাঁওয়ের পুণে ইন্টারন্যাশনালে। এমন নয় যে মুম্বাই অথবা দেশের অন্য কোথাও থেকে এসে দেব-দর্শন করা যাবে না, পথ তো নানান দিক থেকে এসে মিশেছে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবাজী মহারাজের পুণে শহরে। তবে পথের দূরত্ব যখন রেল স্টেশন থেকে ১২৩ আর এয়ারপোর্ট থেকে মাত্রই ১১৮ কিলোমিটার তখন গল্পটাতো সেখান থেকেই শুরু করা ভালো। আমাদের যাত্রা অবশ্য শুরু হয়েছিল দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ২১/১ এর ভোর রাতে। Indigo 6E 6472 ফ্লাইটটা পুণে লক্ষ্য করে আকাশে উড়তেই মনের মধ্যে লাভাসা, ভীমাশঙ্কর আর মহাবালেশ্বরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। আগে কোথা মন করি সমর্পণ – ভাবনায় ভীমাশঙ্করই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। মহাবালেশ্বর অথবা লাভাসার প্রকৃতি নিশ্চয়ই টানছিল, কিন্তু ভুললে চলবে না দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন দৌড়ে আমি শেষ ল্যাপে পৌঁছে গেছি – এটাই যে দশমতম!

সূর্য ওঠার অনেক আগে পুণে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলেও আশঙ্কার কিছু ছিল না, ভাগ্নী ঝিঙ্কা তার কস্ট-একাউনটেন্ট বর বাপ্পাকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছিল। অত সকালেও বানেরের প্যানকার্ড ক্লাব রোডে ওদের বাড়ি পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ

মিনিট লেগে গেল। দূরত্ব তো কম নয় - প্রায় ২১ কিলোমিটার। তারপর কোস্টা ব্লাঙ্কা সোসাইটির ফ্ল্যাটে রাতের ক্লান্তিকে গরম জলে ধুয়ে, ভারী ব্রেকফাস্টে পেট ভরিয়ে, সঙ্গে রাস্তার রসদ নিয়ে যখন শুভমের MH 12 VT 1264 উবারে চেপে বসলাম তখন সকাল ঠিক আটটা। বম্বে-পুণা হাইওয়ে ধরে নাসিকের দিকে চলতে চলতে 'চাকন' হয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম 'MANCHAR', তারপর বাঁয়ে মোড় নিতেই পাহাড়ি পথের আভাস। পুণের ১৮৩৭ ফুট থেকে ভীমাশঙ্করের ৩২৫০ ফুট চড়তে পথ মাঝে মাঝে বেসুরো গাইলেও কখনো তালাও কখনো নদী অথবা সবুজ পশ্চিম ঘাট মন মাতিয়ে রাখে, ক্লান্ত চোখকে ঘুমাতে দেয় না। ঘুমের আর দোষ কি! মাঝরাতের ফ্লাইট বলে পকেট হেসেছে ঠিকই কিন্তু ঘুমটাতো ঝিমুনি হয়ে গেছিল! তবু ভীমা নদীর কাছে ভীমাশঙ্করকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আর চলার পথের সৌন্দর্য ঘুমটাকে সহ্যাদ্রি পাহাড়ের বাউন্ডারি পার করে দিয়েছিল। ভীমাশঙ্করের গল্প বলবো অথচ জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে কিছু কথা হবে না, তা কি করে হয়? শিবঠাকুরের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ হল উজ্জ্বলতা। পুরাণের গল্পে আছে আধিপত্য কার বেশি এই নিয়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে ঝগড়া হলে নিষ্পত্তি করতে তাঁরা শিবের দ্বারস্থ হন। শিব তখন স্তম্ভের আকারের উজ্জ্বল আলো দিয়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই তিনলোককে বিদ্ধ করেন। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে তিনি শর্ত দেন আলোকস্তম্ভের শেষ প্রান্তকে খুঁজে পাওয়া। বিষ্ণু চেষ্টা করেও অসম্ভব বুঝে পরাজয় স্বীকার করে নেন। কিন্তু ব্রহ্মা মিথ্যে করে বিষ্ণুকে বলেন যে তিনি আলোকস্তম্ভের শেষ দেখতে পেয়েছেন। সব কিছু জানতে পেরে ভীষণ ক্রোধে শিব অভিশাপ দেন এই বলে যে সৃষ্টিকর্তা হলেও জগতে কখনো ব্রহ্মার পূজা হবে না। শিবের সৃষ্ট সেই অন্তহীন আলোকস্তম্ভই খ্যাতি লাভ করে জ্যোতির্লিঙ্গ নামে। শিবপুরাণে মোট ৬৪টি জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ থাকলেও তার মধ্যে ১২ টিকে বলা হয় মহান – যারা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে খ্যাত। ভক্তের বিশ্বাস এক জীবনে যদি সবকটি জ্যোতির্লিঙ্গকে অন্ততঃ একবার দর্শন করা যায় তা হলে মহাপুণ্য। আলাদা করেও প্রতিটির স্থান মাহাত্ম্যের জন্য বিশেষ ফল লাভ হয় বলে মনে করা হয়। যেমন সোমনাথের

সোমেশ্বর পূজায় ভক্ত মৃত্যু অন্তে শিব দেহে লীন হন বলে বিশ্বাস, আবার ঝাড়খন্ডের বাবা বৈদ্যনাথের পূজায় কঠিনতর অসুখও নাকি নিরাময় হয়। আর ভীমাশঙ্কর? মহাশোক নাশের আশায় ভক্ত ভিড় করে ১৩ শতাব্দীর প্রাচীন এই শিব মন্দিরে। বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য নতুন রূপে নাগারা সাজে সাজিয়ে তুলেছিলেন পেশোয়া নানা ফড়নবিশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরকে 'KHAROSI' গ্রাম দান করেন মহারাজ শিবাজী। তবে মন্দিরের আর্থিক প্রয়োজন শুধু তাতেই মেটে না, সক্রিয় সাহায্য করে ভীমাশঙ্কর গ্রামের সাধারণ মানুষও। সকালবেলায় যে চলার শুরু হয়েছিল বেলা ১১টা নাগাদ তা শেষ হয়ে গেল বাস স্ট্যান্ডের সামনে। গাড়ি সমেত শুভম পার্কিং-এ চলে গেলে শুরু হয় আমাদের মন্দির অভিযান। সামান্য হাঁটতেই ডাইনে শ্রীকলমজা মাতার মন্দির, তারপরেই বাঁয়ে গেরুয়া পাথুরে মাটির ঢালুপথ। বেশি নয়, বড়জোর শ'খানেক মিটার, তারপরই সিঁড়ি পথ নেমে গেছে শ্রীভীমাশঙ্কর প্রবেশ দ্বারের কাছ থেকে। কমবেশি শ'দুয়েক সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসার পথে রয়েছে পূজার সামগ্রী নিয়ে বেশ কিছু দোকান যেখানে জুতো রাখার ব্যবস্থাও রয়েছে। আমরা অবশ্য উপাচার সংগ্রহ করি শেষতম দোকান থেকে যার পরেই ভক্তের লাইন শুরু হয়েছে দু'পাশে স্টিলের রেলিং দেওয়া পথের ওপর। চৈত্র, বৈশাখ অথবা শ্রাবণ মাস নয়, ভিড় এড়াতে বাদ দিয়েছি বাবার বার সোমবারকেও। তাই ২১শে জানুয়ারীর মঙ্গলবারে খুব বেশি ভিড় আশা করিনি। তেমন ভিড় না হলেও লাইন কিন্তু ছিল। ধীর কিন্তু চলমান সেই ভক্ত দলের সাথে পা মিলিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই মনে এল ভীমাশঙ্করের মাহাত্ম্য। শিবপুরাণ সমেত বিভিন্ন কিংবদন্তি মতে শিব এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন রুদ্র রূপে রাক্ষস ত্রিপুরাসুরের হাত থেকে তিন ভুবনকে রক্ষা করতে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই তিন জগতের আতঙ্ক দূর করতে ত্রিপুরাসুরের সাথে যুদ্ধে নামেন শিব। রাক্ষস বধের পর তিনি সহ্যাদি পাহাড়ের কোলে বিশ্রাম নেওয়ার কালে তাঁর দেহ থেকে যে ঘাম নির্গত হয়, তার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এখানকার ভীমা নদী। দেব দেবীরা সমবেতভাবে তাঁকে অনুরোধ করেন এই পাহাড়েই জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে অধিষ্ঠান করতে। শিব রাজী

হন। তারপর থেকেই ভীমাশঙ্কর হয়ে ওঠে মহারাষ্ট্রের আরেক ঐশ্বরিক স্থান। ইতিমধ্যে লাইন ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছি আমরাও। দেখতে পাই মন্দিরের সন্মুখে বিশাল ত্রিশুল আর সেই ঘণ্টা যা কিনা দান করেছিলেন বাজিরাওয়ের ভাই চিমাজি আপ্পা। সরাসরি দর্শন না হলেও হলেও ডিসপ্লে টিভির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই দেবতার অর্চনা, তার মাথায় দুধ ঢালা আর ভক্ত জনের আকুতি। অবশেষে মূল মন্দিরে ঢুকতেই দেখা যায় কালো পাথরের বৃষরূপী নন্দীকেশ্বর। চর্মচক্ষে ধরা দেন দেবতা ভীমাশঙ্কর। গতবছর মোটামুটি এই সময়েই দেখেছিলাম ওঁঙ্কারেশ্বর আর মহাকালেশ্বর। ভিড়ের চাপে সেখানে ভাল করে দর্শন করতে না পারার যে আক্ষেপ ছিল তা আজ মিটে গেল মনের সাধে দুচোখ মেলে দেব দর্শনে। কোন ঠেলাঠেলি নেই আবার অহেতুক ভিড় ও বাড়াচ্ছে না ভক্তবৃন্দ। তাই মনের সাধে 'নমঃ শিবায়' মন্ত্রে তার অর্চনা করে দেবস্পর্শে ধন্য করি নিজেদের। শিব লিঙ্গ দর্শনের পর মন্দির পরিক্রমা। মুগ্ধ করে কালো পাথরে সজ্জিত সহস্র প্রদীপ। রয়েছে সর্বতীর্থ কুন্ড আর মোক্ষকুন্ড। পরে জেনেছি কুন্ডে স্নান করে দেবতার দর্শনে মোক্ষলাভ হয় – কিন্তু ততক্ষণ তো আমাদের ভীমাশঙ্কর দেখা হয়ে গেছে।

ভীমাশঙ্করের কাছে পিঠে রয়েছে আরো কিছু মন্দির। তার মধ্যে পার্বতীর অবতার শ্রীকলমজা মন্দিরের কথা তো আগেই বলেছি, আর রয়েছে শান্তি ও বন দেবতার মন্দির। চলার পথে ইন্দ্রায়নী নদীর ধারে আলান্দিতে রয়েছে ১৭ শতকের কবি সন্ত তুকারামের সমাধি। এই সেই ইন্দ্রায়নী বা ইন্দ্রানী যে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত মিশে গেছে ভীমানদীর সাথে।

শিবরাত্রির বরণীয় উৎসব অথবা শ্রাবণের সোমবার এলে আমাদের মত দিনে দিনে দর্শন সেরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই থাকার জন্য রয়েছে মন্দিরের যাত্রী নিবাস, সরকারী রেস্ট হাউস আর পি ডব্লু ডি-র বাংলো। MTDC-র রিসর্ট ও ছিল একসময়, তবে আজ তা প্রাইভেট লিজে মান সরোবর মোটেল। আমাদের

অবশ ভীমাশঙ্করে থাকার মতলব অথবা উপায় কোনটাই ছিল না। ভাগ্নীর বাড়িতে রাত কাটিয়ে কাল সকালেই যে ছুটতে হবে মহাবালেশ্বর-পঞ্চগনি পরিক্রমায়।

ভীমাশঙ্কর মন্দির

মন্দিরের ভিতরে

মন্দিরের প্রবেশদ্বার

ত্রিশূল ও ঘন্টা

ভীমাশঙ্করের পথে

শ্রী কালামজা মাতার মন্দির

মন্দিরের প্রবেশদ্বার

DO NOT COPY

চাঁদের পাহাড়ে

সুনন্দন ঘোষ

চিল চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা
ফুটপাথের কাঁথার উপর।
বাবা ভ্যান টানতে গেছে,
মা গেছে লোকের বাড়ী বাসন মাজতে।
আমি বেকার মানুষ ফুটপাথের চায়ের দোকান থেকে
অসহায় ভাবে দেখছি তার কান্না।
যে ছেলেকে ধরার কেউ নেই,
তাকে কোলে নিতে গেলে
আমি ছেলেধরা হয়ে যাবো।
তাই পেরোতে পারছি না লক্ষ্মণের গণ্ডী।

এখন ওর গায়ে ছেঁড়া জামা, মুখে মাছি বসছে,
এই কান্না থেমে যাবে একদিন।
মুছে যাবে শরীরের ক্লেদ, আঘাতের স্মৃতি।
যে উদ্ধত চোখগুলো আজ তাকিয়ে আছে তীব্র অবজ্ঞায়,
তারাই নত হয়ে থাকবে করুণার প্রত্যাশায়।
জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে
ও ঠিক পৌঁছে যাবে চাঁদের পাহাড়ে।

DO NOT COPY